শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসন:
সমস্যা ও উত্তরণের উপায়

সার-সংক্ষেপ

মনজুর-ই-খোদা
শাহজাদা এম আকরাম

৯ মার্চ ২০১৭

শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসন: সমস্যা ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা
অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
চেয়ারপার্সন, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপ-নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক - গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন
মনজুর-ই-খোদা, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি*
শাহজাদা এম আকরাম, *সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি*

গবেষণা সহযোগী
গোলাম মহিউদ্দিন, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, টিআইবি

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে সহায়তা করার জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট সরকারি অংশীজন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী, রিক্রুটিং এজেন্সি ও স্বাস্থ্য পরীক্ষাকেন্দ্রের তথ্যদাতা, সংবাদমাধ্যম কর্মী ও এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের আন্তরিক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা। গবেষণা কার্যক্রমকে পরিচালনা ও প্রতিবেদনের উপস্থাপনার ওপর মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, উপ-নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, আউটরিচ ও কমিউনিকেশন বিভাগের পরিচালক ড. রেজওয়ানুল আলম, গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসানসহ অন্যান্য সহকর্মী, যারা তাদের পর্যবেক্ষণ ও বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে এই গবেষণা প্রতিবেদন সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), ২৭ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: (+৮৮০-২) ৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯
ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৯১২৪৭৯১৫
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসন:
সমস্যা ও উত্তরণের উপায়

সার-সংক্ষেপ*

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শ্রম অভিবাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। দেশের ভেতরে কর্মসংস্থানের চাপ কমানো ও বৈদেশিক মুদ্রার যোগান ও মজুদ বাড়ানোর ক্ষেত্রে বৈদেশিক কর্মসংস্থান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া জাতীয় উন্নয়নে ফেরত আসা অভিবাসীদের বিনিয়োগ ও কারিগরি দক্ষতার কারণে অর্থনীতিতে তাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দেশে রেমিট্যান্স এসেছিল ১ হাজার ৪৯৩ কোটি ডলার, এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৫৩১ কোটি ডলার। প্রবাসী আয় প্রবাহের পরিমাণ বাংলাদেশে অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রার আয় প্রবাহ যথা আনুষ্ঠানিক উন্নয়ন সহায়তা (Official Development Assistance) এবং নীট রপ্তানি আয়কে (Net Earning from Export) অতিক্রম করেছে। ২০১৫ সালে অভিবাসীদের পাঠানো অর্থ বাংলাদেশের জিডিপি'র প্রায় ৭.৮৩%।

বাংলাদেশ থেকে শ্রমের অভিবাসন খাতে সেবা প্রদান, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করার জন্য ১৯৭৬ সালে তৎকালীন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণলয়ের অধীনে 'জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) প্রতিষ্ঠা করা হয়, এবং ১৯৮২ সালে 'বহির্গমণ আদেশ, ১৯৮২' প্রণয়ন করা হয়। শ্রম অভিবাসন খাতের উন্নয়নে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় গঠন করা হয় ২০০১ সালে। পরবর্তীতে আরও বেশ কয়েকটি আইন ও বিধি প্রণীত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ২০০৬ সালে 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি' প্রণয়ন, এবং ২০১৩ সালে 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩' প্রণয়ন। এছাড়া বাংলাদেশ দশটি আন্তর্জাতিক কনভেনশনে স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করেছে যার মধ্যে জাতিসংঘের 'অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের অধিকার সংরক্ষণ কনভেনশন, ১৯৯০' সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ খাতকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য পরবর্তীতে ধারাবাহিকভাবে আরও উদ্যোগ নেওয়া হয়, যার মধ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬ প্রবর্তন, ১৯৮২ সালের আদেশ রহিত করে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ প্রণয়ন, এবং ২০১১ সালের এপ্রিলে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক স্থাপন।

বাংলাদেশ থেকে শ্রমের অভিবাসন-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, আইনি কাঠামো ও অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসনের ওপর বিস্তারিত গবেষণার ঘাটতি রয়েছে। এ সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী শ্রম অভিবাসন খাতে অভিবাসন-পূর্ব ও অভিবাসন-পরবর্তী বিভিন্ন সমস্যা বিদ্যমান এবং এ খাতে এখনো স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা যায় নি (রামরু, ২০১৬)। বাংলাদেশের শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিদ্যমান থাকলেও বিভিন্ন গবেষণা ও সংবাদ-মাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে শ্রম অভিবাসন খাতে বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত ও উদঘাটন করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন গবেষণায় শ্রম অভিবাসন খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, এবং শ্রম অভিবাসন খাতে সুশাসনের অপর্যাপ্ততা ঝুঁকিপূর্ণ অনিয়মিত অভিবাসন ও মানবপাচারকে উৎসাহিত করে বলে মতামত দেওয়া হয়েছে (পারভেজ ও অন্যান্য, ২০১৬; ইকোনমিক ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, ২০১৬; রশিদ ও আশরাফ, ২০১৫; আইওএম, ২০১৫; ম্যাকিনসলে গ্লোবাল ইন্সটিটিউট, ২০১৬)।

শ্রম অভিবাসন খাতে বিপুল সংখ্যক ব্যক্তির কর্মসংস্থান, রেমিটেন্সের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি বিবেচনায় এই বর্তমান গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছে, যেখানে শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসনের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা হয়েছে। এই গবেষণার উদ্দেশ্য বাংলাদেশের শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা ও এসব চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের উপায় চিহ্নিত করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে:

১. বাংলাদেশের শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পর্যালোচনা করা;
২. শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা, তাদের মধ্যকার সমন্বয়, ব্যবস্থাপনা ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্র চিহ্নিত করা;
৩. শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন ও কারণ চিহ্নিত করা; এবং
৪. শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসন ও কার্যকর জবাবদিহিতার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সুপারিশ প্রস্তাব করা।

বর্তমান গবেষণার আওতা হিসেবে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা হচ্ছে- আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে দেশের বাইরে কাজ নিয়ে যাওয়ার বা আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসনের প্রক্রিয়া; আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত সুশাসন কাঠামো পর্যালোচনা; এবং আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় ভ্যালু চেইন, এক্ষেত্রে বিদ্যমান দুর্নীতি ও অনিয়ম, এবং এসব অনিয়মের কারণ অনুসন্ধান।

* ২০১৭ সালের ৯ মার্চ ঢাকায় টিআইবি'র সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত গবেষণা প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ।

বর্তমান গবেষণাটি মূলত গুণবাচক তথ্য বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা। গবেষণার পদ্ধতি হিসেবে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, নিবিড় সাক্ষাৎকার এবং দলগত আলোচনা ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া শ্রম অভিবাসন-সংশ্লিষ্ট নীতিমালা, আইন ও বিধি, প্রকাশিত-অপ্রকাশিত গবেষণা, প্রবন্ধ, সরকারি-বেসরকারি তথ্য ও দলিল, এবং সংবাদপত্র ও অন্যান্য গণ-মাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ পর্যালোচনা করা হয়েছে। ২০১৬ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে গবেষণার খসড়া ফলাফল প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সাথে উপস্থাপন করা হয় এবং তাদের মতামতের ওপর ভিত্তি করে তথ্য-উপাত্ত হালনাগাদ ও যাচাই করা হয়। বর্তমান গবেষণা জরিপ-নির্ভর নয় বলে প্রাপ্ত ফলাফল সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয় বা সাধারণীকরণ সম্ভব নয়, তবে এ খাতে বিদ্যমান পরিস্থিতির একটি দিক নির্দেশনামূলক চিত্র উপস্থাপন করে।

শ্রম অভিবাসন ব্যবস্থাপনা কাঠামো

বাংলাদেশের শ্রম অভিবাসন কাঠামোকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় - প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে একদিকে রয়েছে কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান, এবং অন্যদিকে বেসরকারি রিক্রুটিং এজেন্সি ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা কেন্দ্র। উল্লেখ্য, এসকল প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের আইন ও বিধি দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। অন্যদিকে এ খাতে বেশ কিছু অংশীজন রয়েছে যারা স্বীকৃত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বাইরে থেকে শ্রম অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় স্বতন্ত্র ভূমিকা পালন করছে, যাদেরকে অপ্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

চিত্র ০১: বাংলাদেশের শ্রম অভিবাসন ব্যবস্থাপনা কাঠামো

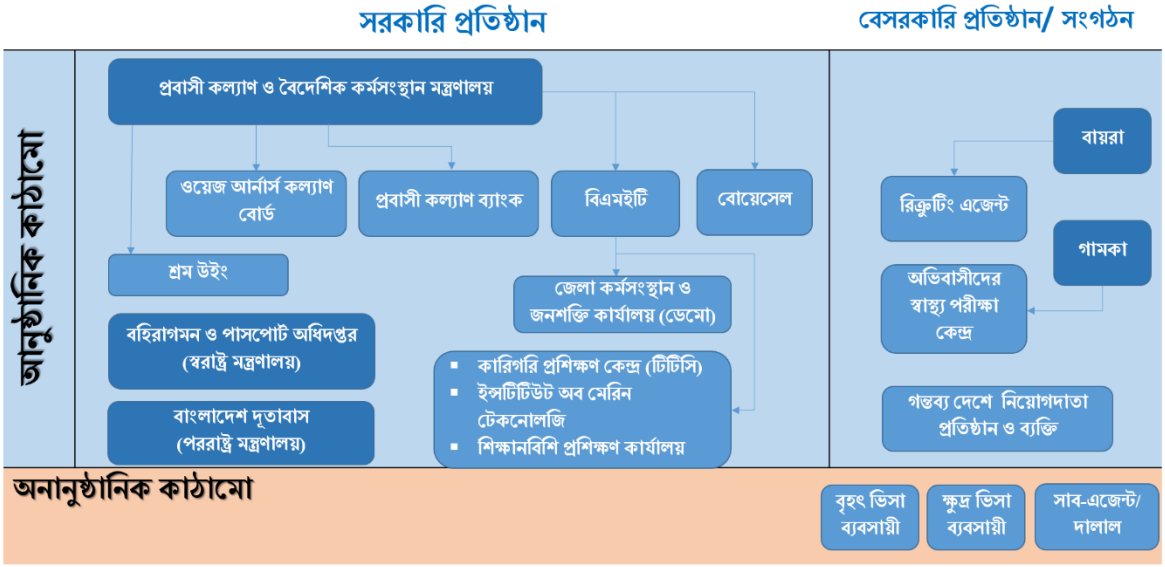

শ্রম অভিবাসন ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে মূখ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় চারটি দপ্তর/ সংস্থার মাধ্যমে সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করছে: ১. জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি); ২. বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল); ৩. ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড; এবং ৪. প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক। মন্ত্রণালয়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উইং হচ্ছে বিদেশের মিশনে অবস্থিত শ্রম উইং, যা এসব দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনীয় সহযোগিতায় শ্রমবাজার সম্প্রসারণের কাজ অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া বাংলাদেশের নাগরিকদের বিদেশে যাতায়াতে সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর নতুন পাসপোর্ট প্রদান ও পুরানো পাসপোর্ট নবায়ন সেবা দিয়ে থাকে। এছাড়া বিশ্বের ৬৫টি বাংলাদেশী মিশনে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট ও মেশিন রিডেবল ভিসা প্রদান করা হচ্ছে।

শ্রম অভিবাসন ব্যবস্থাপনা কাঠামোয় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহ ও তাদের সংগঠন বায়রা (Bangladesh Association of International Recruiting Agencies- BAIRA) অন্যতম। বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য সরকার অনুমোদিত মাধ্যম হচ্ছে ব্যক্তিমালিকানাধীন রিক্রুটিং এজেন্সি বা কোম্পানি। ২০১৬-এর ডিসেম্বরের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী অনুমোদিত এজেন্সির সংখ্যা ১,০৩৭টি। এছাড়া বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হচ্ছে স্বাস্থ্য পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহ

ও তাদের সংগঠন "জিসিসি অনুমোদিত মেডিকেল সেন্টার অ্যাসোসিয়েশন (গামকা) (GCC Approved Medical Centre's Association - GAMCA)"।

শ্রম অভিবাসনের অপ্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত অংশীজনের মধ্যে রয়েছে দেশের বাইরে নিয়োগকারী বা নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠান, বিদেশী রিক্রুটিং এজেন্ট, বড় ও ক্ষুদ্র ভিসা ব্যবসায়ী বা এজেন্ট, এবং দেশের ভেতরে বিভিন্ন স্তরে সক্রিয় মধ্যস্বত্বভোগী ও দালাল। অভিবাসী কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বিদেশী শ্রমিক নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান বা নিয়োগদাতা। মূলত তাদের চাহিদার প্রেক্ষিতেই প্রবাসের শ্রমবাজারে অভিবাসী কর্মীর প্রবেশাধিকার ও কাজের সুযোগ ঘটে।

বাংলাদেশ হতে অভিবাসী কর্মী গ্রহণকারী মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ এবং মালয়েশিয়া, সিংগাপুরসহ প্রায় সব দেশেই বিদেশী শ্রমিক বা অভিবাসী কর্মী সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান বা রিক্রুটিং এজেন্ট রয়েছে। এসব রিক্রুটিং এজেন্সি গন্তব্য দেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পে অভিবাসী কর্মী নিয়োগের চাহিদা মোতাবেক প্রবাসী কর্মী সরবরাহ করে। বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মী গ্রহণকারী দেশগুলোতে একশ্রেণির বাংলাদেশী এবং ভীনদেশী ব্যবসায়ী রয়েছে, যারা অভিবাসী কর্মী নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশী রিক্রুটিং এজেন্সি হতে গ্রুপ ভিসা ক্রয় করে এবং বাংলাদেশের রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর কাছে বিক্রি করে। দুই দেশের শ্রম বাজারে বিদ্যমান লাভজনক এই ভিসা বাণিজ্যে এসব ব্যবসায়ী পাইকারি ভিসা ব্যবসায়ীর ভূমিকা পালন করে।

প্রবাসে কর্মরত বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের একাংশ একই প্রতিষ্ঠানে বা একই নিয়োগদাতার অধীনে দীর্ঘদিন সুনামের সাথে কাজ করার সুবাদে নিয়োগদাতার সাথে ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলে। পরবর্তীতে একই প্রতিষ্ঠানে নতুন অভিবাসী কর্মীর প্রয়োজন হলে, নিয়োগদাতার সাথে তৈরী হওয়া ভালো সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে এবং অর্থের বিনিময়ে নিয়োগদাতাকে রাজি করিয়ে তার কাছ থেকে অভিবাসী শ্রমিকের চাহিদা পত্র সংগ্রহ করে। এ ধরনের ভিসা ব্যবসায়ীকে ক্ষুদ্র ভিসা ব্যবসায়ী বা ভিসা সংগ্রহকারী বলা যেতে পারে, কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব ভিসা অর্থের বিনিময়ে সংগ্রহ করা হয় এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশে সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীর কাছে উচ্চ মূল্যে বিক্রি করা হয়।

বাংলাদেশী রিক্রুটিং এজেন্টসমূহ তাদের সংগৃহীত চাহিদাপত্র অনুসারে অভিবাসী কর্মী সংগ্রহের জন্য মধ্যস্থতাকারী বা দালালের ওপর নির্ভরশীল। সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীদের সাথে রিক্রুটিং এজেন্সির সরাসরি যোগাযোগ থাকে না। অন্যদিকে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো মূলত ঢাকা ও চট্টগ্রাম নগরভিত্তিক; সারাদেশে তৃণমূল পর্যায়ে তাদের শাখা কার্যালয় বা স্থানীয় প্রতিনিধি নেই। ফলে সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মী ও রিক্রুটিং এজেন্সির মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে দালাল বা মধ্যস্থতাকারীরা কাজ করে। তবে এই মধ্যস্থতাকারী বা দালালের আবার শ্রেণিভেদ আছে। প্রথম পর্যায়ের সাব-এজেন্ট বা দালাল সরাসরি রিক্রুটিং এজেন্টের সাথে কাজ করে। অন্যদিকে তাদের সাথে আরেক শ্রেণির দালালের যোগাযোগ থাকে যারা তৃণমূল পর্যায়ে সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। প্রথম পর্যায়ের একজন দালালের সাথে একাধিক তৃণমূল পর্যায়ের দালালের যোগাযোগ থাকে এবং তাদের মাধ্যমেই মূলত অভিবাসী কর্মী সংগ্রহ বা ভিসা বিক্রি করা হয়। প্রথম পর্যায়ের দালালদের নিজেদের ভেতরেও যোগাযোগ থাকে।

সরকারের গৃহীত সাম্প্রতিক পদক্ষেপ

বৈদেশিক কর্মসংস্থান সেবা সহজীকরণের অংশ হিসেবে সরকার সম্প্রতি বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। এক্ষেত্রে সেবার বিকেন্দ্রীকরণ করার উদ্যোগের অংশ হিসেবে ২৫টি জেলায় ফিঙ্গারপ্রিন্ট গ্রহণ করা হচ্ছে। বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করে ঢাকার পাশাপাশি চট্টগ্রামে স্মার্ট কার্ড প্রদান করা হচ্ছে। প্রবাসী কর্মীর পরিবার ও স্বজনদের বিদেশ গমনের ক্ষেত্রে অনাপত্তিপত্র চট্টগ্রাম ও সিলেট থেকেও দেওয়া শুরু হয়েছে। বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীরা যেন নিজেদের ভিসা অনলাইনে যাচাই করতে পারে তার উদ্যোগ হিসেবে বিএমইটি'র ওয়েবসাইটে ও ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে অনলাইন ভিসা যাচাইয়ের সুবিধা রয়েছে, এবং মোবাইল থেকে যাচাই করার জন্য মোবাইল অ্যাপস তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে বাহরাইন, আরব আমিরাত, কাতার ও সিংগাপুরের ক্ষেত্রে এই সুবিধা বিদ্যমান। যেসব দেশে দীর্ঘদিন বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসন বন্ধ ছিল তাদের মধ্যে অনেক দেশে সাম্প্রতিক সময়ে সরকারের কূটনৈতিক উদ্যোগে নতুন করে শ্রম অভিবাসন শুরু হয়েছে। মালয়েশিয়ায় সরকার-সরকার (জিটুজি) প্লাস প্রক্রিয়ায় কর্মী পাঠানোর উদ্দেশ্যে ২০১৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি মালয়েশিয়ার সরকারের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বিদেশে কর্মরত নারী কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য বিএমইটি'তে 'প্রবাসী নারীকর্মী অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল' (Complaint Management and Cell for Expatriate Female Workers) গঠন করা হয়েছে। এছাড়া অভিযোগ সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের জন্য হটলাইন টেলিফোন চালু করা হয়েছে। অভিযোগ দাখিলের জন্য হটলাইনের পাশাপাশি ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে। অভিবাসনের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক থেকে ঋণ প্রদান, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও এসব কেন্দ্রের সক্ষমতা বাড়ানোর উদ্যোগ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়া

বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়া প্রধানত তিনটি পর্যায়ে হয়। প্রথম পর্যায়ে গন্তব্য দেশের নিয়োগদাতা ও সংশ্লিষ্ট মধ্যস্বত্বভোগীদের দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে একদিকে নিয়োগের কার্যাদেশ/ ভিসা কেনা-বেচা হয়, আবার অন্যদিকে গন্তব্য দেশে ভিসা অনুমোদন করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশী দূতাবাসের শ্রম উইংয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়। গন্তব্য দেশ থেকে কার্যাদেশ বা ভিসা কেনার জন্য হুন্ডির মাধ্যমে দেশ থেকে টাকা পাচার করে এদেশী রিক্রুটিং এজেন্সি। শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় পর্যায়ে সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীদের কাছে ভিসা বিক্রি করা হয়। এ পর্যায়ে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত সাব-এজেন্ট বা দালালদের মাধ্যমে সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মী নির্বাচন করে এবং তাদের কাছে দালালরা ভিসা বিক্রি করে। বিভিন্ন হাত ঘুরে ভিসা তাদের কাছে যাওয়ার কারণে ভিসার দাম বহুগুণে বেড়ে যায়। এছাড়া বিনামূল্যে হওয়ার কথা থাকলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারী কর্মীদের কাছ থেকেও অবৈধভাবে টাকা আদায় করা হয় বলে জানা যায়। প্রক্রিয়ার তৃতীয় পর্যায়ে ভিসা প্রক্রিয়াকরণের সময় জটিল একটি প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয় যেখানে অনেকগুলো অংশীজন প্রতিষ্ঠান জড়িত। স্বাস্থ্য পরীক্ষা থেকে শুরু করে পুলিশি ছাড়পত্র, ভিসা স্ট্যাম্পিং, মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন, নিবন্ধন, প্রাক-বহির্গমন প্রশিক্ষণ, এবং চূড়ান্তভাবে বহির্গমন ছাড়পত্র সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ অবৈধভাবে আদায় করা হয় বিদেশগামী কর্মীদের কাছ থেকে।

বিভিন্ন দেশ হতে অভিবাসী কর্মীর চাহিদাপত্র ও ভিসা সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে নিয়োগদাতা, অভিবাসী কর্মী সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ও সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীসহ বিভিন্ন পক্ষ জড়িত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব পক্ষের মধ্যে সংযোগ বা যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তার সূত্রে বেশ কয়েকটি মধ্যস্থতাকারী বা মধ্যস্বত্বভোগী পক্ষ জড়িত হয়। বিভিন্ন গন্তব্য দেশ হতে বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীর জন্য ভিসা সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী পক্ষ হচ্ছে (১) নিয়োগদাতা/ স্পন্সর/ কফিল, (২) গন্তব্য দেশে শ্রমিক সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান/ রিক্রুটিং এজেন্সি, (৩) বৃহৎ ভিসা ব্যবসায়ী/ সংগ্রহকারী, (৪) ক্ষুদ্র ভিসা ব্যবসায়ী/ সংগ্রহকারী, (৫) বাংলাদেশী রিক্রুটিং এজেন্সি, (৬) প্রথম পর্যায় ও তৃণমূল পর্যায়ে সক্রিয় সাব-এজেন্ট বা দালাল, এবং (৭) সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মী।

চিত্র ০২: ভিসা সংগ্রহ ও ভিসা বিক্রির বিভিন্ন ধাপ

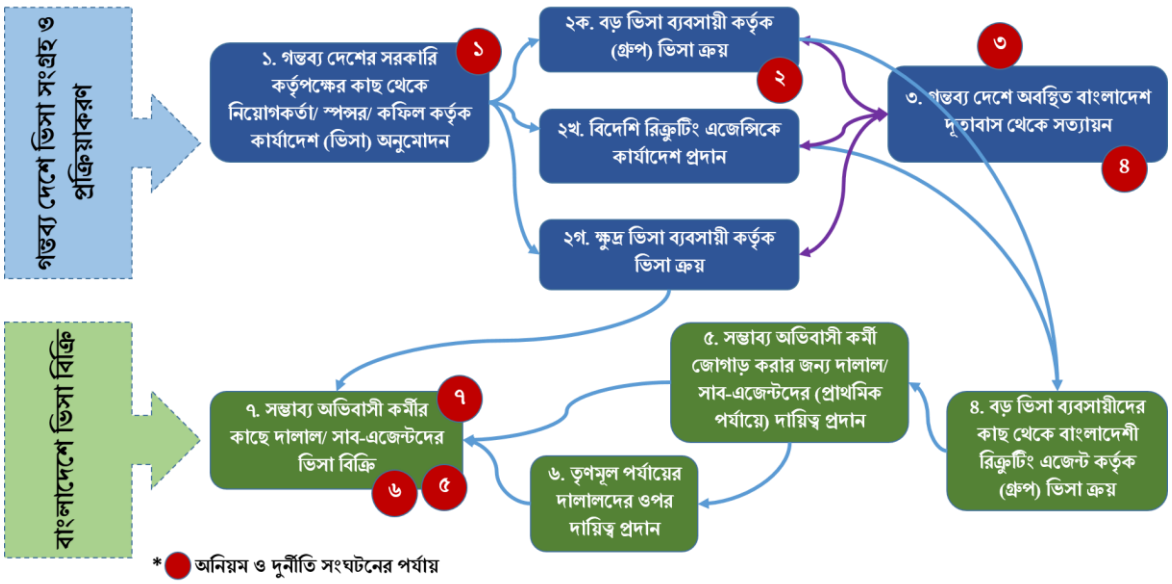

শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হচ্ছে অভিবাসী কর্মী গ্রহণকারী বিভিন্ন দেশ হতে অভিবাসী কর্মীর চাহিদাপত্র ও ভিসা সংগ্রহ। গন্তব্য দেশে সম্ভাব্য নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান বা নিয়োগদাতা কর্তৃক অভিবাসী কর্মীর জন্য চাহিদাপত্র প্রস্তুত করার মাধ্যমে অভিবাসী কর্মীর জন্য ভিসা সংগ্রহ প্রক্রিয়া শুরু হয়। আইনানুযায়ী নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠান বা নিয়োগদাতা গন্তব্য দেশের কোনো অভিবাসী কর্মী সরবরাহকারী রিক্রুটিং এজেন্সিকে প্রয়োজনীয় অভিবাসী কর্মী সংগ্রহের জন্য চাহিদাপত্র ও কার্যাদেশ দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সি অভিবাসী কর্মী সরবরাহ করার জন্য নির্দিষ্ট হারে সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করে। একইভাবে গন্তব্য দেশের, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন ধনাঢ্য ব্যক্তি, যারা সেদেশের আইন অনুযায়ী নিজ গৃহে গৃহকর্মী, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, পাচক, মালি, ড্রাইভার বিভিন্ন পদে অভিবাসী কর্মী নিয়োগ দিতে সক্ষম, তারা স্পন্সর বা কফিল হিসেবে অভিবাসী কর্মীর চাহিদাপত্র তৈরি করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গন্তব্য দেশে অভিবাসী কর্মী সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান বা রিক্রুটিং এজেন্সি নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে চাহিদাপত্র অনুযায়ী অভিবাসী কর্মী সরবরাহের কার্যাদেশ কিনে নেয়। কিছুক্ষেত্রে রিক্রুটিং এজেন্সির পরিবর্তে গন্তব্য দেশের অপ্রাতিষ্ঠানিক বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ভিসা ব্যবসায়ীরাও এই কার্যাদেশ অতিরিক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে থাকে। এই কার্যাদেশের সাথে চাহিদাপত্রের অনুলিপি, নিয়োগকারীর পক্ষে অভিবাসী কর্মী রিক্রুট করার অধিকার বা ক্ষমতাপত্র বা 'ওকালা' দেওয়া হয়।

সৌদি আরবে কাজের জন্য বাংলাদেশ সরকার নির্ধারিত খরচ এক লাখ ৬৫ হাজার টাকা, অথচ একজন অভিবাসী কর্মীকে এক্ষেত্রে ব্যয় করতে হচ্ছে প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ হতে সর্বোচ্চ ১২ লাখ টাকা পর্যন্ত। মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর বা মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে যেতেও কমপক্ষে আড়াই লাখ টাকা হতে সর্বোচ্চ আট লাখ টাকা খরচ হয়ে থাকে। বিভিন্ন গবেষণার তথ্য অনুযায়ী মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমবাজারে কর্মরত অন্যান্য দেশের অভিবাসী কর্মী অপেক্ষা বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীর অভিবাসন ব্যয় কয়েকগুণ বেশি। আন্তর্জাতিক অভিবাসী সংস্থার (আইওএম) তথ্য অনুযায়ীও দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বোচ্চ অভিবাসন ব্যয় হয় বাংলাদেশী অভিবাসী শ্রমিকদের। মূলত গন্তব্য দেশগুলো থেকে ভিসা ক্রয় করার ক্ষেত্রে এই অভিবাসন ব্যয়ের উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যয় হয়।

সারণি ০১: কর্মী প্রেরণকারী দেশভেদে সৌদি আরবের ভিসার বিক্রয়মূল্য

কর্মী প্রেরণকারী দেশ	ভিসার ক্রয়মূল্য (সৌদি রিয়াল)
ফিলিপাইন	ফ্রি টিকেটসহ অতিরিক্ত ৩৭৫০ রিয়াল কর্মীকে প্রদান করা হয়
নেপাল	৫০০ - ৮০০
ভারত	১০০০ – ১৫০০
পাকিস্তান	৩০০০ - ৫০০০
বাংলাদেশ	৭০০০ - ১৫,০০০

অভিবাসী কর্মী সরবরাহের চাহিদাপত্র সংগ্রহের পর সাধারণত গন্তব্য দেশে কার্যাদেশপ্রাপ্ত রিক্রুটিং এজেন্সি বা ভিসা ব্যবসায়ী সেদেশে অবস্থিত বাংলাদেশী দূতাবাস বা হাইকমিশন থেকে চাহিদাপত্র যাচাই ও সত্যায়ন করিয়ে থাকে।

গন্তব্য দেশে অবৈধভাবে ভিসা বিক্রি এবং ভিসা কেনার জন্য হুন্ডির মাধ্যমে অর্থ পাচার: বাস্তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের প্রায় সকল গন্তব্য দেশেই নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠানের কিছু অসাধু কর্মকর্তা উক্ত প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সম্মতিতে অথবা তাদের অগোচরে বিনামূল্যে সরবরাহ না করে চাহিদাপত্র বা ভিসা বিক্রি করে, যা আইনত সম্পূর্ণ অবৈধ। অনেকক্ষেত্রে নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি ভিসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে তাদের প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত অভিবাসী কর্মীর চাহিদাপত্র তৈরি করে এবং পরবর্তীতে তা অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রি করে। বাংলাদেশ ও গন্তব্য দেশ উভয় দেশের আইন অনুযায়ী ভিসা বাণিজ্য নিষিদ্ধ হওয়ায় ভিসা ক্রয় করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বৈধভাবে ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রেরণ করা সম্ভব হয় না। ফলে বাংলাদেশি ভিসা ব্যাবসায়ীগণ ভিসা ক্রয়ে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মূদ্রা বাংলাদেশ হতে অবৈধভাবে হুন্ডির মাধ্যমে গন্তব্য দেশে পাচার করা হয়।

চাহিদাপত্র সত্যায়নে অনিয়ম ও দুর্নীতি: অনেকক্ষেত্রেই গন্তব্য দেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাসের শ্রম উইং চাহিদাপত্র অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট নিয়োগকর্তা সম্পর্কে যথাযথভাবে যাচাই না করেই চাহিদাপত্র সত্যায়ন করে বলে অভিযোগ রয়েছে। কোনো কোনো গন্তব্য দেশে বাংলাদেশী দূতাবাসের বিপক্ষে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের বিনিময়ে চাহিদাপত্র সত্যায়ন এবং হয়রানির অভিযোগ রয়েছে।

সারণি ০২: গন্তব্য দেশভেদে ভিসার ক্রয়মূল্য ও অভিবাসী কর্মীর নিকট বিক্রয়মূল্য (২০১৬ সালের উপাত্ত অনুযায়ী প্রাক্কলন)

ক্রম	দেশ	৯০% পুরুষ কর্মীর সংখ্যা (২০১৬)	ভিসার ন্যূনতম ক্রয়মূল্য	ভিসার ন্যূনতম বিক্রয়মূল্য	মোট ক্রয় মূল্য (কোটি টাকা)	মোট বিক্রয়মূল্য (কোটি টাকা)
১	সৌদি আরব	৬৮,০৬৪	১,২০,০০০	৫,০০,০০০	৮১৭	৩,৪০৩
২	বাহরাইন	৬৪,৮৭৯	৭০,০০০	২,৫০,০০০	৪৫৪	১,৬২২
৩	ওমান	১,৫৭,৮১৫	৭০,০০ ০	২,৫০,০০০	১,১০৫	৩,৯৪৫
৪	কাতার	১,০৩,৫০১	১,২০,০০০	৩,৫০,০০০	১,২৪২	৩,৬২৩
৫	আরব আমিরাত	২,৬৮২	১,০০,০০০	২,৫০,০০০	২৭	৬৭
৬	মালয়েশিয়া	৩৬,০৮৭	১,০০,০০০	৩,৫০,০০০	৩৬১	১,২৬৩
৭	সিঙ্গাপুর	৪৯,১৬৩	২,৫০,০০০	৬,০০,০০০	১,২২৯	২,৯৫০
				মোট	৫,২৩৪	১৬,৮৭৩

** প্রাক্কলনের ক্ষেত্রে মোট পুরুষ অভিবাসী কর্মীর ৯০% হিসাব করা হয়েছে।

২০১৬ সালে শ্রম অভিবাসনের উপাত্ত অনুযায়ী ঐ বছর যে সাতটি দেশে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পুরুষ অভিবাসী কর্মী গিয়েছেন তাদের ৯০ শতাংশের ক্ষেত্রে একটি রক্ষণশীল প্রাক্কলন করে দেখা যায় ভিসা কেনা বাবদ কমপক্ষে ৫,২৩৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে যার পুরোটাই ঐসব দেশে হুন্ডির মাধ্যমে পাচার হয়েছে।

গন্তব্য দেশে বাংলাদেশী দূতাবাসে চাহিদাপত্র সত্যায়নের পর এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সত্যায়ন ছাড়াই এসব চাহিদাপত্র বাংলাদেশী রিক্রুটিং এজেন্সির কাছে বিক্রি করা হয়। সাধারণত বাংলাদেশী রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো গন্তব্য দেশের বিভিন্ন রিক্রুটিং এজেন্সি, প্রবাসী কর্মী নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠান হতে অভিবাসী কর্মী নিয়োগের জন্য চাহিদাপত্র সংগ্রহ করে। একইভাবে রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহ গন্তব্য দেশে বিভিন্ন অপ্রাতিষ্ঠানিক ভিসা ব্যবসায়ীর কাছ থেকেও কর্মীর চাহিদাপত্র সংগ্রহ করে। এছাড়া ক্ষুদ্র ভিসা ব্যবসায়ী অথবা কর্মরত অভিবাসী শ্রমিকদের একাংশের ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংগৃহীত একক (Individual) ভিসা প্রক্রিয়াকরণের কাজও রিক্রুটিং এজেন্সি করে থাকে।

বাংলাদেশী রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সংগৃহীত ভিসা বিক্রির ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব নেটওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যস্বত্বভোগী দালালদের উপর নির্ভরশীল। রিক্রুটিং এজেন্সি নির্দিষ্ট সংখ্যক দলীয় ভিসা সংগ্রহ বা ক্রয় করার পর তার নেটওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত সকল প্রথম পর্যায়ের দালালকে ভিসার দেশ, ভিসার ধরন, প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা, সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীর যোগ্যতা এবং দালালদের জন্য প্রযোজ্য বিক্রয়মূল্য জানিয়ে দেয়। এরপর একজন প্রথম পর্যায়ের দালাল তার নিজ নেটওয়ার্কের সকল তৃণমূল পর্যায়ের দালালের কাছে উল্লিখিত ভিসা সম্পর্কে সকল তথ্য এবং তৃণমূল পর্যায়ের দালালের জন্য তার নির্দিষ্ট বিক্রয়মূল্য জানিয়ে দেয়। সবশেষে তৃণমূল পর্যায়ের দালাল তার নেটওয়ার্কের মধ্যে সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করে এবং তাদেরকে ভিসার সকল তথ্য ও বিক্রয়মূল্য জানিয়ে দেয়। রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহ নিজেদের সংগ্রহ করা ভিসা বিক্রির ক্ষেত্রে ভিসা-প্রতি বিভিন্ন খরচ বাদে ব্যবসায়িক লাভ বাবদ ন্যূনতম ৩০ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা নিয়ে থাকে।

সামগ্রিকভাবে ভিসা সংগ্রহ হতে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন মধ্যস্বত্বভোগীর হাতবদলের মাধ্যমে সর্বশেষ পর্যায়ে অভিবাসী কর্মীর কাছে ভিসা বিক্রির পর্যায়ে ভিসা প্রতি কয়েকদফা মূল্য সংযোজিত হওয়ার মাধ্যমে কয়েকগুণ মূল্য বৃদ্ধি ঘটে। সর্বশেষ পর্যায়ে অভিবাসী কর্মীর কাছে বিক্রয়মূল্যের সাথে সাধারণত কর্মীর স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফি, ভিসা প্রক্রিয়াকরণের বিভিন্ন ধাপে প্রয়োজনীয় সরকারি ফি, আয়কর ও নিয়ম-বহির্ভূত ব্যয়, এবং কর্মীর বিদেশ গমনের টিকেটের মূল্য অন্তর্ভুক্ত থাকে (সারণি ০৩)।

সারণি ০৩: গন্তব্য দেশভেদে বিভিন্ন পর্যায়ে ভিসার বিক্রয়মূল্য (লক্ষ টাকা)

দেশ	নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠান	বিদেশী রিক্রুটিং এজেন্সি	বৃহৎ ভিসা ব্যবসায়ী	ক্ষুদ্র ভিসা ব্যবসায়ী**	বাংলাদেশী রিক্রুটিং এজেন্সি	দালাল (১ম পর্যায়)	দালাল (তৃণমূল পর্যায়)
সৌদি আরব	১.২ – ২.৮	১.৫ – ৩.২	২.০ – ৩.৭	১.২ – ২.৮	৪.০ – ৫.৫	৪.৫ – ৬.৫	৫.০ – ১২*
বাহরাইন	০.৭ – ০.৮	১.০ – ১.৩	১.২ – ১.৫	০.৭ – ০.৮	১.৭ – ২.০	২.০ – ২.৩	২.৫ – ৩.৫
ওমান	০.৭ – ০.৮	১.০ – ১.৩	১.২ – ১.৫	০.৭ – ০.৮	১.৭ – ২.০	২.০ – ২.৩	২.৫ – ৩.৫
কাতার	১.২ – ১.৫	১.৫ – ১.৭	১.৭ – ২.০	১.২ – ১.৫	২.২ – ৩.০	২.৫ – ৩.০	৩.৫ – ৫.০
আরব আমিরাত	১.০ - ১.৫	১.৩ - ১.৮	১.৫ - ১.৮	১.০ - ১.৫	২.৫ - ৩.৫	২.৮ - ৪.০	২.৫ - ৮.০
মালয়েশিয়া	১.০ – ১.৪	১.২ – ১.৫	১.৫ – ২.০	১.০ – ১.৪	২.৫ – ৩.০	৩.৫ – ৫.০	৩.৫ – ৬.৫
সিঙ্গাপুর	২.৫ – ৩.০	২.৮ – ৩.৮	৩.৫ – ৪.৫	২.৫ – ৩.০	৫.০ – ৬.০	৫.৫ – ৬.৫	৬.০ – ৮.০

* নভেম্বর ২০১৬ সৌদি আরবে আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রম অভিবাসন শুরু হওয়ার পর ভিসার মূল্য কমে আসছে।

** ক্ষুদ্র ভিসা ব্যবসায়ী সাধারণত সরাসরি নিয়োগদাতার কাছ থেকে ভিসা ক্রয় করে এবং অভিবাসী শ্রমিকের কাছে বিক্রি করে।

অভিবাসী কর্মীর কাছে দালালদের ভিসা বিক্রি - অতিরিক্ত মূল্য আদায়: সাধারণত দালালদের কাছ হতে ভিসা ক্রয়ের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মী বিদেশে চাকরি সম্পর্কে সবকিছু সঠিকভাবে না জেনেই শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পরিচয়ের উপর নির্ভর করে আর্থিক লেনদেন করে থাকে। ভিসা নিশ্চিতের অনেক আগে থেকেই কিস্তিতে অর্থ জমা দেওয়ার কারণে এবং অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে তৈরি হওয়া নির্ভরশীলতার কারণে সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মী দালালের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে থাকে। বিদেশে চাকরি সম্পর্কে দালাল যেটুকু তথ্য সরবরাহ করে সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীকে তাই বিশ্বাস করতে হয়। সাধারণত আগ্রহী অভিবাসী কর্মীকে বিদেশ গমনের প্রাক্কালে বিমানবন্দরে যাওয়ার পর কাজের চুক্তি তার হাতে দেওয়া হয়। অন্যদিকে, এইসকল দালাল কোন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অন্তর্ভূক্ত না হওয়ায়, তাদের কোন জবাবদিহিতার ক্ষেত্র বা সুযোগ থাকে না। ফলে অনেকক্ষেত্রেই দালালরা অভিবাসী কর্মীর সাথে আর্থিক প্রতারণা, দীর্ঘসময় ধরে ভিসার জন্য হয়রানি করে, এবং ভালো চাকরি বা সুযোগ-সুবিধার প্রলোভনের মাধ্যমে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে থাকে। বর্তমানে সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে গৃহকর্মী ভিসায় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে নারী অভিবাসী প্রেরণ করার নিয়ম থাকলেও, অনেকক্ষেত্রেই দালালরা স্বাস্থ্য পরীক্ষা, বহির্গমন ছাড়পত্র সংগ্রহ, ভালো শহরে পাঠানোসহ বিভিন্ন অজুহাতে প্রতারণার মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে গড়ে ১০ - ১৫ হাজার টাকা আদায় করে থাকে।

ভিসা প্রক্রিয়াকরণ ও বহির্গমন ছাড়পত্র সংগ্রহ

গন্তব্য দেশ হতে ভিসা সংগ্রহ এবং বিভিন্ন পর্যায়ে হাতবদলের মাধ্যমে সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীর কাছে ভিসা বিক্রি নিশ্চিত হওয়ার পর বাংলাদেশে বিভিন্ন ধাপে ভিসা প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন করা হয়। এই পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ, সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা, কর্মীর পুলিশ ছাড়পত্র সংগ্রহ, কর্মীর পাসপোর্টে ভিসা স্ট্যাম্পিং বা কর্মীর নামে পেপার ভিসা সংগ্রহ, কেন্দ্রীয় ডাটাবেজে নাম নিবন্ধন, এবং সবশেষে বিএমইটি হতে অনুমোদনের মাধ্যমে বহির্গমন ছাড়পত্র সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তীতে ফ্লাইট টিকেট সংগ্রহের মাধ্যমে অভিবাসী কর্মী গন্তব্য দেশে গমন করে।

চিত্র ০৩: বাংলাদেশে ভিসা প্রক্রিয়াকরণের বিভিন্ন ধাপ

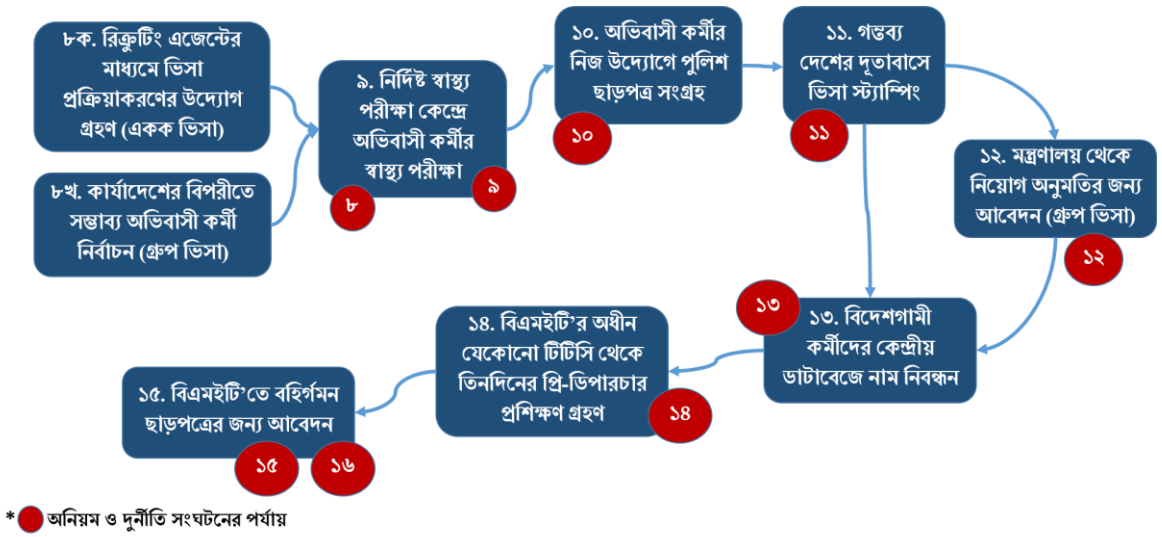

সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মী নির্বাচন: দলীয় ভিসার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে ভিসা প্রক্রিয়াকরণের প্রথম ধাপে আগ্রহী অভিবাসী কর্মী নির্বাচন করা হয়। আইনানুযায়ী রিক্রুটিং এজেন্সি অভিবাসী কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যাদেশ পাওয়ার পর দলীয় ভিসার ক্ষেত্রে চাহিদাপত্র অনুযায়ী কর্মী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় অনুমতি গ্রহণের পর বিএমইটি'র কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ হতে আগ্রহী কর্মী সংগ্রহ করবে। ডেটাবেজে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মী পাওয়া না গেলে সেক্ষেত্রে গণমাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কর্মী সংগ্রহ করার সুযোগ রয়েছে। তবে বর্তমানে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো সাধারণত ডাটাবেজ থেকে কর্মী সংগ্রহ না করে তাদের নিজস্ব দালাল-নির্ভর নেটওয়ার্ক ব্যবহারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আগ্রহী অভিবাসী কর্মী নির্বাচন করে।

অন্যদিকে, ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংগ্রহ করা একক ভিসার ক্ষেত্রে একজন সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীর ভিসা প্রক্রিয়াকরণের প্রথম ধাপ হচ্ছে কোনো নিবন্ধিত রিক্রুটিং এজেন্সির সাথে যোগাযোগ করা এবং ভিসা প্রক্রিয়াকরণে চুক্তিবদ্ধ হওয়া। কেননা দলীয় বা একক, উভয় ভিসার ক্ষেত্রেই বহির্গমন ছাড়পত্রের জন্য নিবন্ধিত রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে বিএমইটি'তে আবেদন করতে হয়, যদিও একক ভিসার জন্য বহির্গমন ছাড়পত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মী নিজেই 'ওয়ান স্টপ' সেবার জন্য আবেদন করতে পারেন, এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিয়ে তা সংগ্রহ করতে পারেন। কিন্তু কার্যত বাংলাদেশ হতে বিভিন্ন গন্তব্য দেশে গমনকারী প্রায় শতভাগ অভিবাসী কর্মী তাদের বহির্গমন ছাড়পত্রের জন্য রিক্রুটিং এজেন্সির ওপর নির্ভরশীল। এখানে সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মী কর্তৃক রিক্রুটিং এজেন্সিকে সরকার নির্ধারিত আয়কর ও বিভিন্ন ফি'র সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ সার্ভিস চার্জও দিতে হয়।

বিদেশগামী কর্মীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং এসংক্রান্ত অনিয়মের অভিযোগ : প্রতিটি গন্তব্য দেশের জন্য সেই দেশের চাহিদা ও মান অনুযায়ী স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য কিছু স্বাস্থ্য পরীক্ষা কেন্দ্র নির্ধারিত আছে। স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য প্রথমে রিক্রুটিং এজেন্সি তার সংগৃহীত চাহিদাপত্র অনুযায়ী গামকা কার্যালয় হতে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক মেডিকেল স্লিপ সংগ্রহ করে। আগ্রহী অভিবাসী কর্মী এজেন্সি প্রদত্ত এই মেডিকেল স্লিপ নিয়ে গামকা কার্যালয়ে হাজির হয় এবং ছবি ও আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে প্রাথমিক নিবন্ধন সম্পন্ন করে। গামকা কার্যালয় হতে আগ্রহী অভিবাসী কর্মীকে তার স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কেন্দ্রের নাম জানিয়ে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে অভিবাসী কর্মী গামকা নিবন্ধন কার্ড নিয়ে তার জন্য নির্বাচিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কেন্দ্রে যেয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত ফি হিসেবে মোট ৬১৫০ টাকা জমা দিতে হয়।

কোনো কোনো স্বাস্থ্য পরীক্ষা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিবাসী কর্মীর কাছে হতে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ আদায় করার অভিযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে মেডিক্যালি যোগ্য প্রার্থীর স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রতিবেদনে তাকে অযোগ্য ঘোষণার ভয় দেখিয়ে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হয় বলে অভিযোগ

রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতার অজুহাতে একই অভিবাসী কর্মীর একাধিকবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোরও অভিযোগ পাওয়া যায়। কোনো কোনো স্বাস্থ্য পরীক্ষা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে নির্ধারিত সকল স্বাস্থ্য পরীক্ষা ছাড়াই এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

গন্তব্য দেশের দূতাবাসে ভিসা স্ট্যাম্পিং: নির্বাচিত অভিবাসী কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে গন্তব্য দেশের দূতাবাস হতে পাসপোর্টে ভিসা স্ট্যাম্পিং করাতে হয়। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রত্যেক অভিবাসী কর্মীর জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ পৃথক ভিসা আবেদন ফাইল তৈরি করতে হয়। অভিবাসী কর্মী ব্যক্তিগত উদ্যোগে নিজের জন্য পুলিশ ছাড়পত্র (Police Clearance Report) সংগ্রহ করে। দূতাবাসে জমা দেওয়া নথির সব তথ্য সঠিক পাওয়া সাপেক্ষে কর্মীর পাসপোর্টে ভিসা স্ট্যাম্পিং করা হয়। তথ্যগত অসম্পূর্ণতা বা ভুল পাওয়া গেলে ফাইল ফেরত দেওয়া হয়। কোনো কোনো গন্তব্য দেশের ভিসা স্ট্যাম্পিংয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের দূতাবাসের বিরুদ্ধে অযথা সময়ক্ষেপন, হয়রানি এবং নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায় করার অভিযোগ রয়েছে। তবে কোনো কোনো গন্তব্য দেশ, যেমন ওমান, বাহরাইন ও কাতারের পাসপোর্টে ভিসা স্ট্যাম্পিংয়ের প্রয়োজন হয় না।

পুলিশি ছাড়পত্র সংগ্রহে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ আদায়: পুলিশ ছাড়পত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে অধিকাংশ অভিবাসী কর্মীর পক্ষ থেকে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ আদায়ের অভিযোগ পাওয়া যায়। এ ছাড়পত্র সংগ্রহের জন্য ৫০০ টাকা থেকে ১,০০০ টাকা পর্যন্ত আদায় করার অভিয়োগ রয়েছে।

মন্ত্রণালয় হতে নিয়োগ অনুমতি, নাম নিবন্ধন ও প্রশিক্ষণ: গন্তব্য দেশের দূতাবাস হতে আগ্রহী অভিবাসী কর্মীর পাসপোর্টে ভিসা স্ট্যাম্পিং হওয়ার পর, অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গন্তব্য দেশ হতে কর্মীর নামে ছাপানো পেপার ভিসা সংগ্রহের পর দলীয় ভিসার ক্ষেত্রে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে অভিবাসী কর্মী নিয়োগ অনুমতির জন্য আবেদন করতে হয়। তবে একক ভিসা প্রক্রিয়াকরণে মন্ত্রণালয়ের অনুমতির প্রয়োজন হয় না।

মন্ত্রণালয়ের অনুমতি পাওয়ার পর বিদেশগামী কর্মীদের কেন্দ্রীয় ডাটাবেজে ছবি ও বায়োমেট্রিক ফিঙ্গার প্রিন্টের মাধ্যমে নাম নিবন্ধন করতে হয়। এক্ষেত্রে সরকারি ফি ২০০ টাকা। বর্তমানে ঢাকার বাইরে ২৫টি জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (ডেমো) হতে ফিঙ্গার প্রিন্ট ও ছবিসহ নাম নিবন্ধন করার সুযোগ রয়েছে। পাসপোর্টে ভিসা স্ট্যাম্পিং হওয়ার পর অথবা পেপার ভিসা সংগ্রহ করার পর বিএমইটি'র তত্ত্বাবধানে পরিচালিত যে কোনো প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে বিদেশ গমন সংক্রান্ত তিনদিনের একটি প্রি-ডিপার্চার প্রশিক্ষণ নিতে হয়। প্রশিক্ষণ শেষে একটি প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সনদ দেওয়া হয়, যা বহির্গমন ছাড়পত্রের জন্য আবেদনের সাথে জমা দিতে হয়।

বহির্গমন ছাড়পত্র গ্রহণ: বিএমইটিতে বহির্গমন ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করার পূর্বে কর্মী সংগ্রহের কার্যাদেশ অনুসারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মী নির্বাচন, নির্বাচিত কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সাপেক্ষে তাদের পাসপোর্টে ভিসা স্ট্যাম্পিং বা পেপার ভিসা সংগ্রহ, কেন্দ্রীয় ডাটাবেজে কর্মীদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট ও ছবিসহ নাম নিবন্ধন, প্রয়োজনীয় প্রি-ডিপার্চার প্রশিক্ষণ এবং দলীয় ভিসার ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের নিয়োগানুমতি নিশ্চিত করতে হয়। সাধারণত রিক্রুটিং এজেন্সির প্রতিনিধি সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীপ্রতি বহির্গমন ছাড়পত্রের জন্য পৃথক পৃথক ফাইল তৈরি করে। প্রতিটি ফাইলের ফরোয়ার্ডিং লেটারে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার অনুমতির স্বাক্ষর সংগ্রহ করে কর্মীর গন্তব্য দেশ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সেকশনে ফাইল জমা দিতে হয়। আবেদন প্রাপ্তির পর কর্মীদের ভিসার সঠিকতা যাচাই, নিয়োগকর্তার সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্র ও অঙ্গীকারনামা যাচাই শেষে বহির্গমন ছাড়পত্র অনুমোদন করা হয়, এবং স্মার্ট কার্ডের মাধ্যমে বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট এজেন্সির প্রতিনিধি সকলের বহির্গমন ছাড়পত্র বা স্মার্ট কার্ড সংগ্রহ করে। সবশেষে কর্মীর পাসপোর্টে ছাড়পত্র নম্বরসহ বিএমইটি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর করাতে হয়।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় হতে নিয়োগানুমতি সংগ্রহের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের একটি অসাধু চক্র ভিসাপ্রতি ১৩,০০০ থেকে ১৫,০০০ টাকা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে আদায় করে বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিএমইটি'র ডাটাবেজ থেকে নিবন্ধিত কর্মী বাছাই না করে তাদের নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অর্থাৎ দালালদের মাধ্যমে কর্মী সংগ্রহ করে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অভিবাসী কর্মী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে উপস্থিত না থেকে বা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ না করেও দালালদের সাথে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের বিনিময়ে প্রশিক্ষণ সনদপত্র সংগ্রহ করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। বিএমইটি থেকে বহির্গমন ছাড়পত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে কর্মী বা ভিসা প্রতি ন্যূনতম ১০০ টাকা হতে ২০০ টাকা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে আদায় করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

২০০৯ সাল হতে মালয়েশিয়ায় বৈধভাবে কলিং ভিসায় বাংলাদেশ হতে স্বল্প দক্ষ ও আধা-দক্ষ অভিবাসী কর্মী নিয়োগ বন্ধ ছিল। অথচ বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ২০১৫ সালে প্রায় ৩০ হাজার এবং ২০১৬ সালে প্রায় ৪০ হাজার অভিবাসী কর্মী বিভিন্ন ভিসায় বিএমইটি হতে বহির্গমন ছাড়পত্র নিয়ে মালয়েশিয়ায় গিয়েছে। এক্ষেত্রে পেশাগত কর্মীর ভিসায় স্বল্প দক্ষ ও আধা-দক্ষ কর্মী পাঠানোর অভিযোগ রয়েছে। গবেষণায়

প্রাপ্ত তথ্যমতে মালয়েশিয়া ইমিগ্রেশন, সংশ্লিষ্ট দূতাবাস এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষের কিছু অসাধু কর্মকর্তার যোগ-সাজশে নিয়ম-বহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের বিনিময়ে এসব কর্মীর বহির্গমন ছাড়পত্র অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এসব ভিসায় মালয়েশিয়া যাওয়ার ক্ষেত্রে বহির্গমন ছাড়পত্রের জন্য বিএমইটিতে ভিসা প্রতি সর্বনিম্ন ৫,০০০ টাকা হতে সর্বোচ্চ ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত নিয়ম-বহির্ভূতভাবে আদায়ের অভিযোগ রয়েছে।

সারণি ০৪: ভিসা প্রক্রিয়াকরণে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও ছাড়পত্র গ্রহণে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের চিত্র

(২০১৬)

ক্রম	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ	নিয়ম-বহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের খাত	২০১৬ সালে ভিসার সংখ্যা	ভিসা প্রতি আদায়কৃত টাকার পরিমাণ
১	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	দলীয় ভিসার ক্ষেত্রে অনুমোদন	৬১,১২২	১৩,০০০ – ১৫,০০০
২	বিএমইটি	বহির্গমন ছাড়পত্রের অনুমোদন	৭,৫৭,৭৩১	১০০ – ২০০
৩	থানা পুলিশ	পুলিশ ছাড়পত্র	৭,৫৭,৭৩১	৫০০ – ১,০০০
	দেশভিত্তিক নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়			
৪	বিএমইটি	মালয়েশিয়ায় পেশাগত ভিসায় অদক্ষ বা আধাদক্ষ কর্মীর জন্য বহির্গমন ছাড়পত্র	৪০,১২৬	৫,০০০ – ১৫,০০০

শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসনের সমস্যার কারণ

শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসনের সমস্যার কারণগুলোকে আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রক্রিয়াগত - এই তিনভাগে ভাগ করা যায়। বাংলাদেশের শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত প্রধান আইন 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসন আইন ২০১৩'তে কয়েকটি ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ও বাস্তবসম্মত নির্দেশনা নেই। বাংলাদেশ থেকে সংঘটিত শ্রম অভিবাসনের সবচেয়ে বড় অংশই (প্রায় ৯০ শতাংশ) ব্যক্তিগত উদ্যোগে হলেও এ বিষয়ে এই আইনে কোনো উল্লেখ করা হয় নি। বরং অভিবাসী কর্মী পাঠানোর কর্তৃত্ব কেবল সরকারি কোনো সংস্থা ও রিক্রুটিং এজেন্টের বলে উল্লেখ করা হয়েছে, এবং কর্মসংস্থান চুক্তির দায়-দায়িত্ব রিক্রুটিং এজেন্টের ওপর নিয়োগকারীর সাথে যৌথ ও এককভাবে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আইনের অনেক ধারা (কর্মী বাছাই, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে) নির্দেশনামূলক, বাধ্যতামূলক নয়, যা আইনের শক্তিকে খর্ব করে। যেমন, আইনের ধারা-১৮তে রিক্রুটিং এজেন্সীর লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত অভিবাসীর ক্ষতিপূরণের কথা বলা হলেও তার বাধ্যবাধকতা রাখা হয় নি। এছাড়া এ খাতে সক্রিয় 'দালাল'দের কার্যক্রম কার্যত আইনের আওতার বাইরে রয়ে গেছে।

শ্রম অভিবাসনের বিধিগুলোতেও কিছু অসংগতি লক্ষ করা যায়। বহির্গমন বিধিমালায় ইমিগ্র্যান্ট রেজিস্ট্রার ও লেবার অ্যাটাশেদের ভূমিকা ও করণীয় সম্পর্কে বলা হয়েছে, কিন্তু তাদের জবাবদিহিতার আওতায় আনার জন্যে কোনো প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করা হয় নি। রিক্রুটিং এজেন্সি লাইসেন্স ও আচরণ বিধিমালায় অভিবাসন সম্পর্কিত অপরাধ ও অনিয়মজনিত কারণে শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু অভিবাসীর ক্ষতিপূরণের কোনো বিধান এখানে নির্দিষ্ট করা হয় নি। এখন পর্যন্ত বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩-এর ওপর ভিত্তি করে কোনো বিধিমালা প্রণীত হয় নি, ২০০২ সালের বিধিমালাই এখনো বিদ্যমান। ফলে এখনকার বাস্তবতায় এ খাতে নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করা সম্ভব হচ্ছে না।

শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান সমস্যা, দুর্নীতি ও অনিয়মের পেছনে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা একটি বড় কারণ। শ্রম অভিবাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে আর্থিক সক্ষমতার ঘাটতি লক্ষ করা যায়। একদিকে এ খাতে বরাদ্দকৃত বাজেট প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল, অন্যদিকে বরাদ্দকৃত বাজেটও সম্পূর্ণ ব্যবহৃত হয় না। শ্রম অভিবাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের প্রতিষ্ঠানেই জনবলের ঘাটতি রয়েছে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে শূন্যপদের হার প্রায় ৩৬.৭ শতাংশ। বিএমইটি'র প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতেও জনবলের ঘাটতি রয়েছে, যে কারণে প্রি-ডিপারচার প্রশিক্ষণে ঘাটতি থেকে যায়।

ভিসা প্রক্রিয়াকরণ এবং রিক্রুটিং এজেন্টদের কার্যক্রমে বিকেন্দ্রীকরণের ঘাটতি বিদ্যমান। ভিসা প্রক্রিয়া করার বিভিন্ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের (রিক্রুটিং এজেন্ট, বিএমইটি, মন্ত্রণালয়, গন্তব্য দেশের দূতাবাস, স্বাস্থ্য পরীক্ষা কেন্দ্র, ট্রাভেল এজেন্ট) কার্যালয় প্রধানত রাজধানী ঢাকায় অবস্থিত, ফলে এসব কাজের জন্য অভিবাসী কর্মীদের একাধিকবার ঢাকায় আসতে হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অভিবাসী কর্মীরা স্বল্পশিক্ষিত ও (পল্লি অঞ্চল থেকে আসার কারণে) ঢাকার পরিবেশের সাথে পরিচিত না হওয়ার কারণে দালালদের ওপরই নির্ভর করতে হয়। অন্যদিকে প্রায় সব রিক্রুটিং এজেন্টের কার্যালয় ঢাকায় (এবং ক্ষেত্রবিশেষে চট্টগ্রামে), এবং মাঠ পর্যায়ে তাদের শাখা না থাকার ফলে অভিবাসী কর্মী বাছাইয়ের জন্য তাদের দালালদের ওপরেই নির্ভর করতে হয়। ফলে সার্বিকভাবে এ খাতটি প্রধানত 'দালাল-নির্ভর'।

ভিসা প্রক্রিয়াকরণের বিভিন্ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ, একজন অভিবাসী কর্মীকে অভিবাসন প্রক্রিয়ায় একাধিকবার বায়োমেট্রিক আইডেন্টিটি, তথা আঙ্গুলের ছাপ ও ছবি দিতে হয়। এছাড়া দলীয় ভিসা ও অপ্রচলিত দেশের ভিসার ক্ষেত্রে বহির্গমন ছাড়পত্রের জন্য মন্ত্রণালয় ও বিএমইটি উভয়ের কাছে আবেদন করতে হয়। শ্রম শাখাগুলো কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করবে বা মিশনে শাখাগুলো কার অধীনে থাকবে তা নিয়েও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে মতপার্থক্য থাকার অভিযোগ রয়েছে। গন্তব্য দেশে ভিসা কেনা-বেচা, গন্তব্য দেশে কর্মসংস্থানের বৈধতা যাচাই, বাংলাদেশে অভিবাসন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির ক্ষেত্রে ঘাটতি বিদ্যমান। শ্রম শাখাগুলোর সেবা দিতে গিয়ে ব্যর্থতার পেছনে অন্যান্য কারণের মধ্যে আছে ভৌগোলিকভাবে বড় আয়তনের দেশগুলোতে মিশনের অবস্থানগত দূরত্ব, দক্ষ কর্মকর্তা ও জনবলের অভাব, আইনি সেবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব। এর মধ্যে সৌদি আরবের মতো বড় রাষ্ট্রগুলোর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে যেতে যে ধরনের যানবাহনের প্রয়োজন হয় তাও নেই অনেক মিশনের।

শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান সমস্যা, দুর্নীতি ও অনিয়মের পেছনের কারণগুলোর মধ্যে প্রক্রিয়াগত সীমাবদ্ধতা অন্যতম। পুরো শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়াটি জটিল ও দীর্ঘ। ভিসা সংগ্রহ থেকে শুরু করে বহির্গমন ছাড়পত্র ও স্মার্টকার্ড পাওয়া পর্যন্ত ২৪ থেকে ২৭টি ধাপ অতিক্রম করতে হয়। এর মধ্যে বিএমইটি'তে রয়েছে নয় থেকে ১১টি ধাপ। ভিসা সংগ্রহ করার জন্য বেশিরভাগ অভিবাসী কর্মী দীর্ঘদিন ধরে দালাল বা ক্ষুদ্র ভিসা ব্যবসায়ীকে টাকা দেন। বহির্গমন ছাড়পত্রের জন্য মন্ত্রণালয়ে সত্যায়িত ভিসার ক্ষেত্রে ৩ হতে ৫ দিন এবং অসত্যায়িত ভিসার ক্ষেত্রে ৭ হতে ১৫ দিন সময় লাগে। এক্ষেত্রে নিয়ম-বহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ আছে এবং এই লেনদেনের ওপর অনুমোদনের দীর্ঘসূত্রতা নির্ভরশীল। পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে প্রায় ৩০ - ৪৫ দিন ব্যয় হয়। অন্যদিকে বিএমইটি থেকে বহির্গমন ছাড়পত্র প্রাপ্তি প্রায় শতভাগ ক্ষেত্রে এজেন্সি-নির্ভর। বর্তমানে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী স্বল্প দক্ষ ও আধা-দক্ষ অভিবাসী কর্মীদের বহির্গমন ছাড়পত্রের জন্য ব্যক্তিগতভাবে আবেদনের সুযোগ নেই। দলীয় ভিসার ক্ষেত্রে বহির্গমন ছাড়পত্রের জন্য মন্ত্রণালয় ও বিএমইটি উভয়ের কাছে আবেদন করতে হয়।

শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়াটি প্রায় পুরোটাই 'দালাল-নির্ভর'। ফলে লাইসেন্সপ্রাপ্ত রিক্রুটিং এজেন্সির সাথে অভিবাসী কর্মীর সরাসরি যোগাযোগ প্রায় অনুপস্থিত। বিদেশে নিয়োগ ও কাজের শর্তাবলী সংক্রান্ত তথ্য, অভিবাসন সংক্রান্ত তথ্য, অভিবাসন প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদির জন্য অভিবাসী কর্মীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দালালদের ওপর নির্ভরশীল। একইভাবে তৃণমূল পর্যায় থেকে কর্মী বাছাই, তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা, ভিসা প্রক্রিয়াকরণে সহায়তা ইত্যাদির জন্য রিক্রুটিং এজেন্টরাও দালালদের ওপর নির্ভরশীল। এসব কারণে অভিবাসী কর্মীদের একটি বড় অংশই আর্থিক লেন-দেনে কোনো রশিদ নিতে পারে না, ফলে এ খাতে ব্যয়ের দালিলিক প্রমাণ অনুপস্থিত রয়ে যায়। সকল দেশের জন্য সরকারিভাবে অভিবাসনের ব্যয় নির্ধারিত নেই। কোনো অভিবাসী কর্মী প্রতারিত হলে কী পরিমাণ ক্ষতিপূরণ পাবে তা প্রয়োজনীয় দালিলিক প্রমাণের ঘাটতি থাকায় নির্ধারণ করা যায় না, এবং সংশ্লিষ্ট অভিবাসী কর্মী সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পায় না।

বাংলাদেশে সম্ভাব্য আগ্রহী অভিবাসী কর্মী যেকোনো মূল্যে ভিসা কিনতে চায়, এবং দালালদের কাছে টাকা জমা রাখে। অন্যদিকে গন্তব্য দেশে কর্মীর চাহিদা সীমিত, এবং বেশ কয়েকটি প্রধান গন্তব্য দেশে গত কয়েকবছর শ্রম অভিবাসন বন্ধ ছিল। ফলে সেসব দেশেও বৈধ উপায়ের বাইরে গিয়ে অভিবাসনের প্রবণতা তৈরি হয়েছে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে গন্তব্য দেশে ভিসা ব্যবসায়ীদের অসাধু প্রতিযোগিতা তৈরি হয়, এবং মধ্যস্বত্তভোগীদেরও অতিরিক্ত মুনাফা করার প্রবণতা তৈরি হয়।

বাংলাদেশ থেকে বিদেশগামী কর্মীদের একটি বড় অংশেরই শিক্ষা ও দক্ষতার ঘাটতি বিদ্যমান। অভিবাসন প্রক্রিয়ার জটিলতা ও প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে এবং একইসাথে সামাজিক যোগাযোগের কারণে দালালদের ওপর তাদের আস্থা ও নির্ভরতা রয়েছে। সরকার বা অন্য কোনো অংশীজনের সাবধান বাণী তারা গ্রাহ্য করে না। বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রচার ও প্রকাশেও ঘাটতি রয়েছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়- এ সম্পর্কে সঠিক তথ্য থাকা জরুরি। বর্তমানে ৪২টি জেলায় ডেমো কার্যালয় থেকে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ওপর তথ্য দেওয়া হয়, এবং কয়েকটি বেসরকারি সংস্থার এ ধরনের তথ্য প্রচার সংক্রান্ত কার্যক্রম রয়েছে। কিন্তু এসব কার্যক্রম খুব সীমিত পর্যায়ের, এবং সরকারের পক্ষ থেকে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য, যেমন কোন দেশে কী ধরনের কাজ করা যায়, কোন কাজে কী ধরনের বেতন, কী ধরনের সুযোগ-সুবিধা রয়েছে
ইত্যাদি সম্পর্কে প্রচার-প্রচারণার ঘাটতি রয়েছে। শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রচার ও প্রকাশেও ঘাটতি রয়েছে।

শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি ও অনিয়ম সংক্রান্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে আইন প্রয়োগে ঘাটতি লক্ষ করা যায়। প্রণয়নের পর থেকে মানব পাচারের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী ২০১৩' আইনের অধীনে মামলা না হওয়ার প্রেক্ষিতে উচ্চ আদালত ২০১৫ সালের ৫ মার্চ সরকারকে ব্যাখ্যা করার জন্য রুল জারি করে। এখন পর্যন্ত এ আইনের অধীনে আটটি মামলা দায়ের করা হলেও এখন

পর্যন্ত কোনো বিচার সম্পন্ন হয় নি। অন্যদিকে মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২ প্রণয়নের পর থেকে এখন পর্যন্ত দুই শতাধিক মামলা হলেও এর মধ্যে একটি মামলাও এখনো বিচারের জন্যে প্রস্তুত হয় নি।

আবার বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ে অভিবাসী কর্মীদের কাছ থেকে রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে প্রাপ্ত অভিযোগের একটি বড় অংশই একদিকে নিষ্পত্তি হয় না বলে দেখা যায়, আবার অন্যদিকে নিষ্পত্তি হওয়া অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রতারিতদের ক্ষতিপূরণ পুরোটা আদায় করা হয় না। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৩৮০টি অভিযোগের মধ্যে ৮৯টি অভিযোগ (২৩.৪২%) অভিযোগের নিষ্পত্তি করা হয়েছে, এবং প্রতারণার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর কাছ থেকে মোট আট লাখ ৯০ হাজার টাকা, অর্থাৎ মাথাপিছু গড়ে ১০ হাজার টাকা আদায় করে অভিযোগকারীদের প্রদান করা হয়।

চিত্র ০৪:সুশাসনের নির্দেশকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ

নির্দেশক	উপ-নির্দেশক	সমস্যা
স্বচ্ছতা	▪ অভিবাসন সংক্রান্ত তথ্যের সহজলভ্যতা ▪ অভিবাসন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্যের প্রকাশ	▪ অভিবাসন সম্পর্কে (ব্যয়, শর্ত, প্রক্রিয়া) প্রয়োজনীয় তথ্য সহজলভ্য নয় ▪ অভিবাসন সংক্রান্ত তথ্য সহজবোধ্যভাবে প্রকাশিত নয় ▪ অভিবাসনের প্রকৃত ব্যয়ের দালিলিক প্রমাণ থাকে না
জবাবদিহিতা	▪ শ্রম অভিবাসন কার্যক্রমের শক্তিশালী তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ ▪ অভিবাসন ব্যস্থাপনায় কাজের বিভাজন ▪ সব অংশীজনের জবাবদিহিতা	▪ তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে ঘাটতি ▪ একাধিক প্রতিষ্ঠানের একই ধরনের কাজ সম্পাদন ▪ সব অংশীজনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত না করা
সক্ষমতা ও কার্যকরতা	▪ অভিবাসন ব্যবস্থাপনার জন্য সক্ষম ও কার্যকর কাঠামো ▪ মসৃণ ও দ্রুত অভিবাসন প্রক্রিয়া ▪ শ্রম অভিবাসনের স্বল্প ব্যয়	▪ জড়িত অংশীজনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি ▪ জটিল, দীর্ঘ প্রক্রিয়া ▪ অনানুষ্ঠানিক ব্যক্তি-নির্ভর প্রক্রিয়া ▪ উচ্চ ব্যয়-সম্পন্ন প্রক্রিয়া
আইনের শাসন	▪ প্রয়োজনীয় আইনি ও নীতি কাঠামো ▪ আইনের সুষ্ঠু ও ন্যায্য প্রয়োগ	▪ আইনি সীমাবদ্ধতা ▪ আইনের প্রয়োগে সীমাবদ্ধতা ▪ অভিবাসন প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি ও অনিয়ম বিদ্যমান ▪ ন্যায্য ও সঠিক ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা যায় না

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা যাচ্ছে শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে আইনি কাঠামোতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেমন অভিযোগ উত্থাপন, কর্মী বাছাই, ক্ষতিপূরণ আদায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা রয়েছে। এছাড়াও আইনের প্রয়োগে কিছু সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান থাকার কারণে প্রত্যাশিত পর্যায়ে এখনো প্রয়োগ হচ্ছে না। অন্যদিকে শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়া তদারকি ও নিয়ন্ত্রণে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে।

বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়া দীর্ঘ, জটিল, অনিশ্চিত, এবং এখনো প্রায় ঢাকা-কেন্দ্রিক, যা এ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি ও অনিয়মের ঝুঁকি তৈরি করে। এ প্রক্রিয়া অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যক্তি ও প্রক্রিয়া নির্ভর, ফলে অভিবাসী কর্মীদের প্রতারিত ও বঞ্চিত হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও প্রতারিত হওয়ার পর প্রয়োজনীয় দালিলিক প্রমাণের অভাবে প্রাপ্য ও প্রকৃত ক্ষতিপূরণ পায় না। তথ্যের উন্মুক্ততার ক্ষেত্রেও ঘাটতি বিদ্যমান, যে কারণে গন্তব্য দেশে কর্ম পরিবেশ, বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা, ভিসার মূল্য/ অভিবাসন ব্যয়ের খাত সম্পর্কে তথ্য অভিবাসী কর্মীর পক্ষে সহজে জানা সম্ভব হয় না, এবং এর জন্য সে বেশি নির্ভর করে দালালদের ওপর।

বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতি বিদ্যমান। ভিসা প্রক্রিয়াকরণের বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়ম-বহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে। এর সাথে অনিয়ন্ত্রিত ভিসা বাণিজ্যর ফলে যার ফলে অভিবাসন ব্যয় আরও বেড়ে যায় এবং অভিবাসী কর্মীর ওপর এই ব্যয়ভার পড়ে। ফলে প্রত্যাশিত পর্যায়ে অভিবাসনের সুফল পাওয়া যায় না। শ্রম অভিবাসনের উচ্চ ব্যয়ের কারণে কাজের জন্য অবৈধ পথে বিদেশে যাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং বিদেশে অবৈধ হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।

চিত্র ০৫: একনজরে শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসনের ঘাটতির কারণ, ফলাফল ও প্রভাব

কারণ	ফলাফল	প্রভাব

▪ আইনি ও প্রায়োগিক সীমাবদ্ধতা ▪ জটিল ও দীর্ঘ অভিবাসন প্রক্রিয়া ▪ প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি - অর্থ, জনবল ▪ বিকেন্দ্রীকরণ, বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির ঘাটতি ▪ অভিবাসী কর্মীর চাহিদার তুলনায় সরবরাহ বেশি ▪ অভিবাসী কর্মীর শিক্ষা, দক্ষতা ও সচেতনতার ঘাটতি ▪ তথ্য সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা ▪ প্রকৃত ব্যয় সংক্রান্ত দালিলিক প্রমাণের ঘাটতি	▪ অবৈধভাবে ভিসা বিক্রি ▪ ভিসা কেনার জন্য অবৈধভাবে অর্থ পাচার ▪ নিয়োগদাতার তথ্য যাচাই না করে ও অর্থের বিনিময়ে সত্যায়ন ▪ অভিবাসী কর্মীদের উচ্চমূল্যে ভিসা ক্রয় ▪ অভিবাসী শ্রমিকের ওপর উচ্চ অভিবাসন ব্যয়ভার ▪ দালাল-নির্ভর ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ▪ শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে (চাহিদাপত্র সত্যায়ন, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, পুলিশি ছাড়পত্র, ভিসা স্ট্যাম্পিং, নিয়োগ-অনুমতি, বহির্গমন ছাড়পত্র) অবৈধভাবে অর্থ আদায় ▪ প্রাপ্য ও প্রকৃত ক্ষতিপূরণ না পাওয়া	▪ প্রত্যাশিত পর্যায়ে অভিবাসন ও বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পরিপূর্ণ সুফল না পাওয়া ▪ প্রতারিত, বঞ্চিত ও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি ▪ অবৈধ পথে বিদেশে যাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি ▪ বিদেশে অবৈধ হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি

সুপারিশ

গবেষণার পর্যবেক্ষণ ও ফলাফল থেকে শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসন ও কার্যকর জবাবদিহিতার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশ প্রস্তাব করা হলো।

১. 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসন আইন ২০১৩'-এর নিম্নলিখিত সংস্কার করতে হবে:

- কর্মী বাছাই, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ, ক্ষতিপূরণ প্রদান ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট ধারাগুলোকে বাধ্যতামূলক করতে হবে;
- "অন্য যেকোনো আইনে যা-ই থাকুক না কেন, শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে এই আইন অগ্রাধিকার পাবে" এমন ধারা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

২. ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংগৃহীত একক ভিসার জন্য বহির্গমন ছাড়পত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে বিএমইটি কর্তৃক ওয়ান স্টপ সেবা কার্যকর করতে হবে।

৩. বাংলাদেশ থেকে যেসব দেশে বেশি কর্মী যায় সেসব দেশে কর্মসংস্থান তদারকির ক্ষেত্রে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন শ্রম উইং-এর সক্ষমতা (বাজেট, জনবল) ও দক্ষতা বাড়াতে হবে।

৪. দালালদেরকে জবাবদিহিতার আওতায় আনার জন্য তাদেরকে রিক্রুটিং এজেন্টদের সাব-এজেন্ট বা নিবন্ধিত প্রতিনিধি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার বিধান করতে হবে।

৫. সরকারি নির্ধারিত অভিবাসন ব্যয়ের ন্যূনতম পাঁচগুণ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৬. দলীয় ভিসা প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নেওয়ার ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে।

৭. অভিবাসী কর্মীর ছবি ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে তথ্য বিনিময়ে কার্যকর সমন্বয় করতে হবে।

৮. সকল গন্তব্য দেশের ভিসা অনলাইন চেকিংয়ের ব্যবস্থা নিশ্চিতে সরকারের কূটনৈতিক পদক্ষেপ জোরদার করতে হবে।

৯. সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীদের সচেতনতা বাড়ানোর জন্য

- শ্রম অভিবাসনের বিভিন্ন বিষয় যেমন বিদেশে কাজের ধরন, সরকার-নির্ধারিত অভিবাসনের ব্যয়, অভিবাসনের বৈধ প্রক্রিয়া সম্পর্কে তথ্য সহজলভ্য করতে হবে;
- তৃণমূল পর্যায়ে শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত প্রচার-প্রচারণা (রেডিও, টেলিভিশনে সম্প্রচার, তথ্যমেলা, পথ নাটক) বাড়াতে হবে;
- মন্ত্রণালয়, বিএমইটি, বোয়েসেল ও বায়রার ওয়েবসাইটে অভিবাসীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এমন তথ্য (যেমন বিদেশে কাজের ধরন, সরকার-নির্ধারিত অভিবাসনের ব্যয়, অভিবাসনের বৈধ প্রক্রিয়া) সহজভাবে পরিবেশন করতে হবে।